**Rajshahi University journal of arts & law Vol. 50 (2022) pp. 15-30**
**ISSN 2309-0898**

# আনিস চৌধুরীর মানচিত্র : একটি বিশ্লেষণ
# [Anis Chowdhury's Manchitra: An Analysis]

**সাদ্দাম হুসাইন***


**Abstract**

Anis Chowdhury is one of the few playwrights who have enunciated their own voices in the dramatic literature of pre-independence Bangladesh. His best play is *Manchitra* (Map in English). The visual life described in the first seven scenes of the nine-scene play is basically the transitional East Bengal feudal society between February 16, 1950 (When the 'East Bengal State Acquisition and Tenancy Act' was passed), and May 16, 1951 (When the 'East Bengal State Acquisition and Tenancy Act' came into force). Scenes eight and nine take place five years after this period– when the feudal economy of Bangladesh has transformed into a capitalist economy. In this article, through the analysis of these two periods, it is shown through the Historical, Descriptive, Content Analytical, and Comparative Methods, that the *Manchitra* is not the illustration of educated middle-class or lower-middle-class life, but rather the educational problem of Bangladesh under Pakistan (16.02.1950-16.05.1951)– particularly, not paying teachers, retrenchment of teachers on various pretexts, and miserable life of retrenched teachers– above all, it 'maps' the breakdown of feudal society and the rise of capitalist society.


**চাবিশব্দ:** *মানচিত্র*, জমিদারি প্রথা, শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নমধ্যবিত্ত জীবন, সামন্ত অর্থনীতি, পুঁজিবাদী সমাজ

[**Keywords:** *Manchitra*, Zamindari System, Education System, Educated Middle Class or Lower Middle Class Life, Feudal Economy, Capitalist Society]

## ১. ভূমিকা

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে মুসলিম লীগ নেতারা গ্রামে-গঞ্জে গিয়ে প্রচার করতে থাকেন যে, পাকিস্তান ভিন্ন মুসলমানদের উন্নতির অদ্বিতীয় পথ নেই। পাকিস্তান মানে হিন্দু জমিদারের নিপীড়ন থেকে মুসলিম চাষির মুক্তি। প্রজাস্বত্ব এবং কৃষক ঋণ-সংক্রান্ত কয়েকটি জনমুখী আইনও প্রবর্তন করা হয় এই সময়। ফলে গ্রামের সাধারণ মুসলিম চাষিও অনুধাবন করতে থাকে, পাকিস্তান ছাড়া তাদের মুক্তি নেই। তিরিশের দশকের শেষে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) গ্রামে গিয়ে ডাল-ভাত, জমিদারি উচ্ছেদ আর বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিশ্রুতি দিতেন।[১] কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দেখা গেল জমিদারি উচ্ছেদ হলো না; রক্ষা হলো না ডাল-ভাত কিংবা বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিশ্রুতি। এছাড়া এসময় 'ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা' পরিবর্তনসাধনের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি, বরং ব্রিটিশ আমলে শিক্ষার যে কাঠামো ছিল, সেটাও ভেঙে পড়তে থাকে। ফলে মধ্যবিত্ত পরিবারের যে সকল শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ লাভ করে, তাদেরও শিক্ষার মান দ্রুতগতিতে নেমে যেতে থাকে। অর্থাভাবে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বৃদ্ধির পরিবর্তে হ্রাস পায়। স্কুল-কলেজ বন্ধ হতে থাকে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকরা ছাঁটাই হতে থাকেন এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সংখ্যাও কমে আসে।[২] পাকিস্তান আমলের এমত সংকটাপন্ন পরিস্থিতিকে বিষয় করে নাট্যকার আনিস

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়, নেত্রকোণা ২৪০০, E-mail: sadhossain94@gmail.com

চৌধুরী (১৯২৯-১৯৯০) রচনা করেন *মানচিত্র* (১৯৬৩) নাটক। এই নাটকে পাকিস্তান-অধীন বাংলাদেশের শিক্ষাসমস্যা– বিশেষত শিক্ষকদের বেতন না-দেওয়া, বিভিন্ন অজুহাতে শিক্ষক ছাঁটাই করা, ছাঁটাই হওয়া শিক্ষকের দুর্বিষহ জীবন– সর্বোপরি সামন্ত সমাজের ভাঙন এবং পুঁজিবাদী সমাজের উত্থানের চিত্র শিল্পিত হয়েছে।

**২. মানচিত্র মঞ্চস্থের পটভূমি**

*মানচিত্র* ৮ এপ্রিল ১৯৫৬ সালে করাচিতে মঞ্চস্থ হলেও নাটকে বিধৃত সময়ের কোনো উল্লেখ নেই। তবে এই নাটকে নাট্যকার ইয়াকুব জমিদারের চরিত্র চিত্রণ করেছেন। সুতরাং, ইয়াকুব জমিদারের চরিত্র এবং পূর্ববাংলার জমিদারি প্রথার ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই নাটকে বিধৃত সময় সম্পর্কে জানা সম্ভব হবে। ঐতিহাসিকতথ্যমতে, ১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস (Lourd Cornwallis; ১৭৩৮-১৮০৫) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষণার মাধ্যমে সৃষ্টি করেন এক নতুন ধরনের জমিদার শ্রেণি।[৩] এই আইনের ফলে জমিদার শ্রেণি জমিদারি নিলামের আশঙ্কা থেকে মুক্ত রাখার লক্ষ্যে এবং আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রায়তের নিকট থেকে উচ্চ হারে কর আদায়ে নিয়োজিত হয়। ফলে রায়তদের জীবনে নেমে আসে দুর্বিষহ দুর্ভোগ। এরপর ১৮৮৫ সালে রেন্ট কমিশনের সুপারিশমালার ভিত্তিতে প্রজাস্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্থলে ব্রিটিশ সরকার 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন' (Bengal Tenancy Act) প্রবর্তন করে। 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন' (বিটিঅ্যাক্ট)-এ প্রজাদের অধিকার ও স্বার্থ অনেকটা নিশ্চিত হলেও জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রজাদের অসন্তোষ নিরসন হয় না। ফলে ১৯৩৮ সালে ফ্রান্সিস ফ্লাউড (Francis Floud; ১৮৭৫-১৯৬৫) এর নেতৃত্বে 'ল্যান্ড রেভিনিউ কমিশন' (Land Revenue Commmission) গঠন করা হয়। এই কমিশন ১৯৪০ সালের ২১ মার্চ সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনা করে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের মাধ্যমে প্রজাদের সরকারের অধীনে ন্যস্ত করার সুপারিশ করে। এ বিষয়ে *Report of the Land Revenue Commmission Bengal*, Vol. 1 (১৯৪০) এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৯৬ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয় :

> It is in the light of these considerations that the majority of the members of our Commission have been led to the conclusion that whatever may have been the justification for the Permanent Settlement in 1793, it is no longer suited to the conditions of the present time. A majority of the Commission have also come to the conclusion that the zamindari system has developed so many defects that it has ceased to serve any national interest. No half measures will satisfactorily remedy its defects. Provided that a practicable scheme can be devised to acquire the interests of all classes of rent-receivers on reasonable terms, the policy should be to aim at bringing the actual cultivators into the position of tenants holding directly under Government. We recognise that this proposal involves a fundamental change in the rural economy, of Bengal, affecting vitally the whole social and economic structure of the Province, that it can only be carried out gradually over a term of years, and that it would be a most formidable administrative undertaking, which will tax to the full all the resources of Government.[8]

কমিশনের এই সুপারিশ জমিদারের স্বার্থবিরোধী হওয়ায় জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীগণ সুপারিশ-বাস্তবায়নে বিরোধিতা করে। এরপর ১৯৪৫ সালে সরকার 'ল্যান্ড রেভিনিউ কমিশন' এর সুপারিশসমূহ পরীক্ষা করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য স্যার আর্কিবল্ড রোল্যান্ড (Sir Archibald Rowlands; ১৮৯২-১৯৫৩) এর সভাপতিত্বে গঠন করা হয় *'ব্যঙ্গল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইনকুয়ারি কমিটি'* (Bengal Administrative Enquiry Committee)। এই কমিটি ১৯৪৫ সালের ৩০ মার্চ 'ল্যান্ড রেভিনিউ কমিশন' এর সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রতিবেদন দাখিল করে। ফলে সরকার 'ল্যান্ড রেভিনিউ কমিশন' এর

সুপারিশ বিবেচনায় আনে এবং বাস্তবায়নের জন্য ১৯৪৭ সালের ১০ এপ্রিল ব্যবস্থাপক পরিষদে উত্থাপন করে 'বেঙ্গল স্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড টেনেন্সি বিল' (Bengal State Acquisition and Tenency Bill)। ভারতবিভাগের কারণে এ বিষয়ে আর কোনো অগ্রগতি হয়নি। বস্তুত দেশভাগের প্রথম দিকে 'পূর্বপাকিস্তান রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব বিল' (East Pakistan State Acquisition and Tenancy Bill) প্রণয়ন করে ১৯৪৮ সালের ৩১ মার্চ তা প্রকাশ করা হয়। অতঃপর এই বিলটিকে পাঠানো হয় আইন পরিষদের বিশেষ কমিটিতে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিলটি 'পূর্বপাকিস্তান রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন' (East Pakistan State Acquisition and Tenancy Act) হিসেবে পাস হয় ১৯৫০ সালে ১৬ ফেব্রুয়ারি। এরপর আইনটি কার্যকর করা হয় ১৬ মে ১৯৫১ সালে :

> ... the East Pakistan State Acquisition and Tenancy Bill was framed and published on the 31st March, 1948. [Dacca Gazette, Extraordinary, deted 6th April, 1948, Part IVA, pp. 59-60] It was then reffeed to the Special Committee of the House. They made considerable modifications in the Bill, the most important of which was the addition of Chapter II which 'has been added to provide for the acquisition of some big rentreceiving interests as early as possible.' [The report of the Special Committee on the East Pakistan State Acquisition and Tenancy Bill, 1948, dated 6th July, 1949, Ch. IA : Dacca Gazette, Extraordinary, deted 16th August, 1949, Part IVA, p. 548] The Bill was enacted on the 16th February, 1950 as the East Pakistan State Acquisition and Tenancy Act, 1950 and was reserved for the assent of the Governor-General who give his assent on the 16th May, 1951. The new Act has abolished the zamindary system in East Pakistan and repealed the Bengal Tenancy Act, 1885. It nowhere says when it will come into force. In the absence of such a provision it was held that it has come into operation from the 16th May, 1951, the date when the Governor-General has given his assent.[৫]

উল্লেখ্য, আইনটি (East Pakistan/ East Bengal State Acquisition and Tenancy Act) ১৯৫১ সালের ১৬ মে কার্যকর হলেও যেহেতু ১৯৫০ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি পাস হয়, সেহেতু আইনটি 'পূর্ববঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০' হিসেবেই পরিগণিত হয়। 'East Bengal Act XXVIII of 1951'-এ আইনটিকে 'East Bengal State Acquisition and Tenancy Act, 1950' নামে অভিহিত করা হয়েছে : 'This Act may be called the East Bengal State Acquisition and Tenancy Act, 1950.'[৬] স্মর্তব্য, 'East Bengal State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (E. B. Act No. XXVIII of 1951) [16th May, 1951]'-এ যে পাদটীকা সংযুক্ত হয়েছে, সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ :

> For Statement of Objects and Reasons, *see Dacca Gazette, Extraordinary*, deted 16th August, 1949, Part IVA, p. 547; for proceedings in Assembly, *see* the proceedings of the meetings of the East Bengal Ligislative Assembly held on the 7th April, 1948, 16th to 17th, 21st to 26th, 28th to 30th November, 1st to 3rd, 5th to 10th and 13th to 16th February, 1950.
>
> The Act was extended to those areas of the district of Mymensingh, which were known as 'Pratially Excluded Areas' immediately before the Presidential Proclamation of 7th October, 1958, with effect from the 16th May, 1951.[৭]

উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তসমূহ থেকে জানা যায় যে, 'পূর্ববঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন' পাস হয় ১৯৫০ সালে ১৬ ফেব্রুয়ারি এবং কার্যকর হয় ১৯৫১ সালের ১৬ মে। যার ফলে পূর্ববঙ্গ (বাংলাদেশ) থেকে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হয়। প্রসঙ্গত, ১৬.০২.১৯৫০ থেকে ১৬.০৫.১৯৫১ সাল পর্যন্ত জমিদার এবং প্রজার সম্পর্ক কেমন ছিল, জমিদাররা কি এসময় কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করেনি কিংবা খাজনার প্রথাইবা কেমন ছিল– এমনসব জিজ্ঞাসা থাকাটাই সমীচীন। কিন্তু গভীরভাবে দেখলে বোধগম্য হয়, আইনটি যেহেতু ১৯৫০ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি পাস হলেও কার্যকর হয়নি, সেহেতু ১৯৫১ সালের ১৬ মে

পর্যন্ত জমিদাররা প্রজাদের নিকট থেকে খাজনা আদায় করেছে। প্রজারা কেউ খাজনা দিয়েছে বা দেয়নি। কারণ, তারা নিজেরাও আন্দোলন করেছে জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে। ফলে ১৯৫০ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারির (জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ) আইন পাস হওয়ার ঘটনা কোনোভাবেই তাদের অজানা ছিল না। কারণ, তারা ধরেই নিয়েছিল আইনটি শীঘ্র কার্যকর হবে। এজন্য ১৯৫১ সালের ১৬ মে পর্যন্ত তারা খাজনা দিতে গড়িমসি করেছে, কিন্তু জমিদাররা পূর্বের মতো নির্যাতন করতে পারেনি। কারণ, আইনটি 'প্রণীত হওয়ার পূর্বে জমিদাররা দীর্ঘদিন কৃষক আন্দোলনের ফলে অনেকখানি সংযত হতে এবং কৃষকদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা অনেকাংশে কমিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছিলো।'[৮] মূলত এই সময়টা (১৬.০২.১৯৫০-১৬.০৫.১৯৫১) ছিল জমিদারি প্রথার ভগ্নলগ্ন। আনিস চৌধুরী তাঁর *মানচিত্র* নাটকের সংলাপে জমিদারি প্রথার এই ভগ্নলগ্নকে চিত্রিত করেছেন এভাবে:

| | | |
|---|---|---|
| নায়েব | : | হুজুর কদমপুরের খাজনাটা– |
| ইয়াকুব | : | আদায় কত? |
| নায়েব | : | খাজনা চাইতে গেলেই প্রজারা বলে– |
| ইয়াকুব | : | প্রজারা কি বলে সে কথা শুনে কাজ নেই। আমি কি বলি সেটা প্রজাদের বলেছ? |
| নায়েব | : | বলেছি হুজুর– |
| ইয়াকুব | : | তারপর? |
| নায়েব | : | বলে, টাকার কি গাছ দিয়েছি? |
| ইয়াকুব | : | বুঝেছি, থাম। ভেবেছিলাম জমিদারী কাজটা তোমার ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত হব। নাঃ, কিছু হবে না তোমাকে দিয়ে। |
| নায়েব | : | (ভেবে নিয়ে) হুজুর– |
| ইয়াকুব | : | আবার কি বলবে? |
| নায়েব | | একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে হুজুর। ব্যাটাদের আচ্ছা জব্দ করা যায়। গেলেই বলে টাকা নেই। হুজুর গায়ের শক্ত-সমর্থ লোক সবাই শহরে কাজ করে। মাসে মাসে তারা টাকা পাঠায়– |
| ইয়াকুব | : | তাতে তোমার খাজনা আদায় হবে কিসে? |
| নায়েব | : | হবে, হুজুর হবে। এই কার কার নামে টাকা এল– সেটা হুজুর– মানে কি পোস্টম্যানকে কিছু দিলে নামটা সহজেই জানা যায়। তারপর লিস্টি মিলিয়ে পাকড়াও করলে– |
| ইয়াকুব | : | তা মন্দ বলনি– তা মন্দ বলনি, তাহলে দেখ কপাল *ঠুকে*–[৯] |

লক্ষণীয়, নায়েবের সংলাপে জানা যায়– সে কোনোভাবেই প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে পারছে না এমনকি ইয়াকুব জমিদারের শোষণ-নির্যাতনে হুমকিকেও তারা অগ্রাহ্য করেছে ('আমি কি বলি সেটা প্রজাদের বলেছ?'– সংলাপের মধ্যেই সেটা দৃষ্ট হয়) এবং খাজনা না-দিয়ে নায়েবকে বলেছে, 'টাকার কি গাছ দিয়েছি?'– সংলাপটির মধ্যেই মূলত ইয়াকুবের জমিদারসুলভচিত্তের দুর্বলতা দৃষ্ট হয়। উল্লেখ্য যে, *জমীদার দর্পণ নাটকের* (১২৭৯ ব.) জমিদার হায়ওয়ান আলীর খাজনা আদায়, প্রজানির্যাতন, শোষণ, লাম্পট্য এবং উচ্ছৃঙ্খলতার যে নিদর্শন, তা *মানচিত্র* নাটকের জমিদার ইয়াকুবের মধ্যে বিদ্যমান নেই। নেই তার খাজনা আদায়ের শক্তি। ফলে তার নায়েব খাজনা আদায়ের নতুন কৌশল বাতলালে সে বলে, 'তাহলে দেখ কপাল *ঠুকে*'। বস্তুত প্রজার খাজনা যখন জমিদারের 'কপালে' নির্ভর করে, কিংবা প্রজারা যখন বলে– 'টাকার কি গাছ দিয়েছি?', তখন ধরে নেওয়াই সমীচীন যে, ইয়াকুব জমিদারি প্রথার ভগ্নলগ্নের (১৬.০২.১৯৫০-১৬.০৫.১৯৫১) এক জীর্ণজমিদার। উল্লেখ্য, প্রজারা ১৯৫০ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি জমিদারিপ্রথা উচ্ছেদ-আইন পাস হওয়ার সংবাদ জেনেছে বিধায় ইয়াকুব জমিদারের হুকুম এবং হুমকি কর্ণপাত করেনি এবং খাজনা না-দিয়ে নায়েবকে 'টাকার কি গাছ দিয়েছি?'– এমন কথা বলার সাহস

দেখিয়েছে। স্মর্তব্য, ইয়াকুব জীর্ণজমিদার হলেও মানসিকভাবে সে জমিদার, সামন্তসমাজের প্রতিনিধি। কাজেই জমিদারি ঠাট বজায় রাখতেই সামান্য ক্যাশবাক্সের গেলাফ তৈরির জন্যে সে চায় নামকরা দর্জি। এছাড়া যেহেতু সে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ে সক্ষম নয়, সেহেতু অর্থ-উপার্জনের নতুন মাধ্যম হিসেবে মডার্ন হাই স্কুলের সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে। মূলত সে বিদ্যালয়কে পরিণত করেছে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে। ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন বাবদ প্রাপ্ত অর্থ চলে যায় তার ব্যক্তিগত তহবিলে। অর্থাৎ অর্থ-আত্মসাতই তার মূল উদ্দেশ্য– যার জোগানদাতা স্কুলের হেডমাস্টার মনসুর। জীর্ণজমিদার ইয়াকুবের অর্থ-আত্মসাতের দৃশ্যকে নাট্যকার সংলাপবদ্ধ করেছেন এভাবে :

ইয়াকুব : ... এবার কাজের কথায় এস মাস্টার।

মনসুর : স্যার অর্ধেক ছেলেরই বেতন বাকী। ফাইনের ভয় দেখিয়ে আদায় করেছি। তা স্যার যা ইকনমিক ক্রাইসিস–

ইয়াকুব : ওসব হক্কি-চক্কি রাখো। সবশুদ্ধ হল কত?

মনসুর : দুশো তিরাশি টাকা সাত–

ইয়াকুব : বাস্ বাস্, পাই-গণ্ডার হিসাব কে চাইছে, এনোছো কই দাও।

মনসুর : এই– এই স্যার– [টাকার থলি হাতে দিল]

ইয়াকুব : স্কুলের হিসাবের খাতাপত্র ঠিক রেখেছো তো?

মনসুর : তা আর বলতে স্যার। আয় নেই এক পয়সা। সব ব্যয়, এই যেমন ধরুন না স্যার– স্কুল মেরামত, ফ্রি স্টাইপেণ্ডশীপ, সাজ-সরঞ্জাম কেনা– তা স্যার সেদিক দিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না, হিসাব একদম পাকা।[১০]

এই প্রকারে অর্থ-আত্মসাতের কারণেই স্কুলের দরিদ্র শিক্ষকরা নিয়মিত বেতন পায় না। এমনকি বৈধ বেতন প্রার্থনা করলে শিক্ষকদের ওপর রুষ্ট হয়ে সে বলে : 'এটা কি দানছত্র! আরে মাইনে বাকী– আদায় না হলে কি ঘরের পয়সা এনে তোমাদের উদর ভরতে হবে। এইতো হেডমাস্টারের মুখে শুনলাম, ছেলেরা ঠিকমত মাইনে দিচ্ছে না। স্কুলের যা আয় সেতো স্কুলেই থাকছে। আমি তো আর এক পয়সা নিচ্ছি না।'[১১] এমনতরো মিথ্যাচার করে স্কুলের অর্থ-আত্মসাতের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থে সে তার জমিদারি ঠাট বজায় রাখে। মূলত সে চায় না যে চাষাভূষোর সন্তান শিক্ষিত হোক। কারণ, সে জানে চাষাভূষোর সন্তান শিক্ষিত হলে একসময় তারা প্রতিবাদী হয়ে উঠবে। উঠেছিলও। ঐতিহাসিকসাক্ষ্যমতে 'পূর্ববঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০' প্রণীত হওয়ার পূর্বে এদেশে অনেক কৃষক-আন্দোলন (নানকার আন্দোলন, টঙ্কপ্রথা বিরোধী আন্দোলন, নাচোল কৃষক বিদ্রোহ) সংঘটিত হয়েছিল। যে আন্দোলনগুলোর নেতৃত্ব দিয়েছিল চাষাভূষোর শিক্ষিত সন্তানরাই। যার–

> মূল রাজনৈতিক ধ্বনি ছিলো 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়', রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিলো পাকিস্তান রাষ্ট্র উচ্ছেদ করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। মূল অর্থনৈতিক সমস্যা ছিলো বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ, খাজনা হ্রাস, জোতদারী ও মহাজনী শোষণ-অত্যাচার বন্ধ করা, খাস জমি কৃষকদের ফেরৎ দেওয়া, উল্টো তেভাগা বন্ধ, অকৃষকদের হাত থেকে জমি কেড়ে নিয়ে খোদ কৃষকদের ভিতর সেই জমি বন্টন করা। 'লাঙল যার জমি তার'– এই ধ্বনির মাধ্যমে কৃষকদেরকে সমবেত ও ঐক্যবদ্ধ করে জমি দখলের মাধ্যমে সংগ্রামকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে গিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলই ছিলো এই সময়কার আন্দোলনের গৃহীত লাইন।[১২]

উল্লেখ্য যে, এই আন্দোলন যেহেতু শিক্ষিত কৃষকসন্তানদের নেতৃত্বেই সংঘটিত হয়েছিল, সেহেতু এই শ্রেণির ওপর জমিদার ইয়াকুবের ছিল 'প্রবলভয়'– যার পরিপ্রেক্ষিতে সে সর্বদাই তাদের প্রতি ছিল ঈর্ষাকাতর। যে ঈর্ষাকাতরতা– সর্বোপরি 'ভয়'কে নাট্যকার সংলাপবদ্ধ করেছেন এভাবে:

কলিম : হুজুর স্কুল না করলে গরীবের ছেলেপুলেরা যে উচ্ছন্নে যেতো–

ইয়াকুব : তাই যেতো, সেটাই ভালো ছিল। খাল কেটে কুমীর ডেকেছি। আরে আমাকে কি শেখাবে মাস্টার! এই চাষাভূষোর ছেলেরা দু'কলম পড়ে আজ বাদে কাল চোখ রাঙাতে আসবে, সে আর আমি জানিনে– খুব জানি।[১৩]

এই 'ভয়' সামন্তসমাজের প্রতিনিধিদের ছিল। তারা চাইত তারাই কেবল শিক্ষিত হবে এবং শোষণ করবে। অপরদিকে চাষাভূষোর সন্তান শিক্ষিত না-হয়ে মূর্খ থেকে কেবল চাষাবাদ করবে আর শোষিত হবে। এটাই সামন্তমানসিকতা– যে মানসিকতার প্রতিনিধি জমিদার ইয়াকুব।

### ৩. মানচিত্র নাটকে দৃশ্যমান জীবনালেখ্য

*মানচিত্র* নাটকে নয়টি দৃশের প্রথম সাতটি দৃশ্যে যে দৃশমান জীবনের ব্যাখ্যা বিধৃত হয়েছে তা মূলত ১৯৫০ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি (যখন 'পূর্ববঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন' পাস হয়) ও ১৯৫১ সালের ১৬ মে (যখন 'পূর্ববঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন' কার্যকর হয়– যার মাধ্যমে উচ্ছেদ হয় জমিদারিপ্রথা) এ দুয়ের অন্তর্বর্তীকালীন পূর্ববঙ্গীয় সমাজ। কারণ, এ নাটকে নাট্যকার জমিদারিপ্রথার ভগ্নলগ্নের জীর্ণজমিদার ইয়াকুবের চরিত্র সুনিপুণভাবে চিত্রণ করেছেন। অতএব ১৬.০২.১৯৫০ থেকে ১৬.০৫.১৯৫১ কালখণ্ডে এদেশের শিক্ষকদের অবস্থা পর্যালোচনা করা সমীচীন। কারণ, নাটকটিতে মুখ্যত শিক্ষক ছাঁটাই, ছাঁটাই হওয়া শিক্ষকের দুর্বিষহ জীবন এবং শিক্ষাসমস্যা শিল্পিত হয়েছে। ১৬.০২.১৯৫০ থেকে ১৬.০৫.১৯৫১ কালখণ্ডে এদেশের শিক্ষা এবং শিক্ষকদের অবস্থা :

১. পল্লীর অসহায় প্রাথমিক শিক্ষক ও সহরের [শহরের] বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকগণ ঝড়ের মুখে হাল ছাড়িতে বাধ্য হইতেছেন। পল্লীর শিক্ষায়তনগুলি আজ প্রেতপুরীতে পরিণত হইয়াছে। কংকালসার শিক্ষকেরা ধীরে ধীরে তাহাদের জীবনীশক্তি হারাইয়া ফেলিতেছেন। আগত সমাজের মানবগোষ্ঠীর ভবিষ্যত অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা সমস্যা জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। বহু শিক্ষক শিক্ষাকেন্দ্রগুলি ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন– তাহা পূরণের কোন সক্রিয় চেষ্টা শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ হইতে আজও হয় নি। আজ সরকারের শিক্ষা প্রসারের কোন পরিকল্পনা দেখা যাইতেছে না। যে সকল ব্যক্তিবর্গের অতীত জীবনে কোন মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় নাই তাহারাই জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনার ভার লইয়াছেন। শিক্ষা জগতে যদি দেখা দেয় রাজনৈতিক শক্তি পরীক্ষার প্রতিযোগিতা তবে বাস্তবিক তাহা জাতীয় দুর্দিন বলিতে হইবে। ... আমাদের রাষ্ট্র পরিচালকগণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে মুখ্য স্থান না দিয়া দেশ রক্ষার অজুহাতে বিদ্যাকেন্দ্রগুলি হুকুম দখল করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছেন না।[১৪]

২. সরকারী স্কুল কলেজগুলির সংস্কারের প্রশ্ন তুলতেই সরকার তা ধামাচাপা দিতে একটি বড় ওজর তুলেছে– 'শিক্ষক পাওয়া যায় না।' কিন্তু সঠিক খবর নিলে জানা যাবে যে, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল কলেজগুলি থেকে এলাউন্স কেটে নেওয়া নিয়ম মোতাবেক বর্ধিত বেতন মঞ্জুর না করা ইত্যাদি, পরোক্ষ শিক্ষক ছাঁটাই নীতির চাপে, এমনকি সরাসরি চাকুরিতে জবাব পেয়ে বেকারত্ব বরণ করেছেন এমন শিক্ষকের সংখ্যা নগণ্য নয়। সরকারী স্কুল কলেজগুলিতে অনেক শিক্ষককেও যতদিন খুশী অস্থায়ী পদবাচ্য করে রাখা হয়েছে ও হচ্ছে। অনেক সময় তিন চার মাস ধরে গরীব শিক্ষকদের মাইনে বাকী ফেলে রাখা হয়েছে। এই অবহেলার দরুন সর্বত্র সরকারী বেসরকারী স্কুল কলেজগুলি ভেঙ্গে পড়তে লাগল, হিন্দু শিক্ষকগণ অনেকেই পশ্চিমবঙ্গে চলে গেলেন।[১৫]

৩. রিলিফ কাজের জন্যে আমাকে একবার সুখানপুকুর (বগুড়া) যেতে হয়েছিল। সেখানে ঘটনাক্রমে

একজন প্রাইমারী শিক্ষকের সঙ্গে পরিচিত হই। যখন তাঁকে দেখি তখন বেলা ১২টা। স্কুলের সময় অথচ তাঁকে ক্ষেতে লাঙ্গল ঠেলতে দেখে আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম :
আপনার স্কুল নেই?
: আছে।
: তবে এখানে কেন?
ভদ্রলোক তাঁর চাষ রেখে অনেক কিছুই বলে গেলেন। তিনি বললেন : ত্যারো টাকা মাইনে, তাও পাই নি আজ ৯ মাস। উপায় কি?
আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁর পরনে ছিল পাতলা ছেঁড়া গামছা আর দেহ নগ্ন। মনে রাখতে হবে তিনি স্বাধীন রাষ্ট্রের একজন শিক্ষক এবং ভদ্রলোক।
জিজ্ঞেস করলাম : স্কুল কখন করেন?
স্কুল?
তাঁর ভ্রূ কুঁচকে গেল।
: সে ত কবে ফক্কা। ছাত্ররা ত' বোনার পাড়ায় কুলিগিরি করে। কেউবা হয়েছে ছিঁচকে চোর।[১৬]

লক্ষণীয়, উদ্ধৃতিত্রয়ের প্রথমটি ১৪.০৯.১৯৫০ তারিখে 'নওবেলাল'-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ; দ্বিতীয়টি ০১.০৯.১৯৫০ তারিখে 'সত্যযুগ'-এ প্রকাশিত অলি আহাদের (১৯২৮-২০১২) লিখিত অভিভাষণ; তৃতীয়টি নিখিল পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৬.০৯.১৯৫০) পেশকৃত শিক্ষাসম্পর্কীয় একটি রিপোর্ট– যেখানে পাকিস্তান অধীন বাংলাদেশের শিক্ষাসংকট এবং মুখ্যত শিক্ষকদের বেতন না-দেওয়া, বিভিন্ন অজুহাতে শিক্ষক ছাঁটাই এবং ছাঁটাই হওয়া শিক্ষকের দুর্বিষহ জীবনকথা বর্ণিত হয়েছে। আনিস চৌধুরীর *মানচিত্র* নাটকের মজিদ এই কালখণ্ডের (১৬.০২.১৯৫০-১৬.০৫.১৯৫১) শিক্ষকশ্রেণির প্রতিনিধি– যার দুর্বিষহ জীবনকথাই মূলত *মানচিত্র* নাটক।

নাটকের প্রধান চরিত্র স্কুলশিক্ষক মজিদ। স্কুল থেকে উপার্জিত সামান্য মাইনের ওপরই নির্ভরশীল তার পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট পরিবার– যেখানে রয়েছে বিবাহযোগ্য কন্যা রানু, কিন্তু তার পাত্রস্থ করার মতো অর্থ নেই; পুত্র আমিন– যে দুবার পরীক্ষা দিয়েও কৃতকার্য হতে পারেনি। কারণ, বছর গড়িয়ে গেলেও মজিদ কিনে দিতে পারেনি প্রয়োজনীয় বইপত্র। ফলে লেখাপড়া প্রায় ছেড়ে দিয়ে একপ্রকার হতাশাগ্রস্ত জীবনযাপন করছে সে। এদিকে বাড়িতে সাবান নেই, তেল নেই, নেই নিত্যপ্রয়োজনীয় বাজার করার মতো পয়সা। কারণ, আড়াই মাস যাবত স্কুল থেকে এক পয়সাও মাইনে পাইনি। উল্লেখ্য, এতদিন মাইনে না-পেয়ে এবং সংসারের নানান নিত্যনৈমিত্তিক নাসূচক নেতির মধ্যে জীবনযাপন করলেও সে মাইনের জন্য কারো দারস্থ হয়নি। ফলে সংসারের অবস্থা যখন কোণঠাসাদশায় পরিণত হয়েছে তখন তার স্ত্রী মরিয়ম তাকে বলেছে, 'বাজার তো আর এমনি আসবে না। কাল থেকে বলছি একটু দ্যাখো– তোমার হুঁশ থাকলে তো! এমন মানুষ দেখিনি বাবা, চুরি না ডাকাতি। পাওনা টাকা তাও চাইতে লজ্জা! যা খুশী করগে।'[১৭] এমতাবস্থায় মজিদ বাধ্য হয়েই আরেক শিক্ষক কলিমকে সঙ্গে নিয়ে স্কুল-সেক্রেটারি ইয়াকুবের দারস্থ হয়েছে। কারণ, তারা জানত ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন বাবদ প্রাপ্ত অর্থ চলে যায় ইয়াকুবের ব্যক্তিগত তহবিলে। কাজেই, ইয়াকুবের দারস্থ হওয়া ছাড়া তাদের অবশিষ্ট নেই অদ্বিতীয় উপায়:

ইয়াকুব : কি চাই?
মজিদ : বড় বিপদে পড়ে–
কলিম : বিপদে না পড়লে এ সময় হুজুরকে বিরক্ত করতাম না। ... হুজুর আমাদের মাইনে বাকী। আড়াই মাস থেকে একটা পয়সার নাম গন্ধ নেই।
মজিদ : মাসের দশ তারিখ। ছেলেপুলের সংসার, সবে তো ক'টি টাকা। সময় মত না পেলে–
কলিম : হুজুর স্কুলের গরীব মাস্টারদের উপর একটু কৃপা না করলে আমরা যাই কোথায়?

ইয়াকুব : দেখ মাস্টাররা তাহলে খুলেই বলি। প্যাঁচের কথা আমার ভাল লাগে না। স্কুল করেছি বলে কি আর মাথা বেচে দিয়েছি?[১৮]

লক্ষণীয়, মজিদ ও কলিম মাস্টারের সংলাপে নমনীয় ভাব এবং ইয়াকুবের সংলাপে রুষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে। কারণ, ইয়াকুব জমিদার এবং স্কুল-সেক্রেটারি। কাজেই পাওনা পয়সা চাইতে গিয়ে ইয়াকুব যাতে রুষ্ট না হয় সে জন্যই তাদের এই নমনীয়তা। কেননা, ইয়াকুব রুষ্ট হলেই যে কোনো মুহূর্তে তারা হারাতে পারে চাকরি– যা তাদের অদ্বিতীয় উপার্জনমাধ্যম এবং যার ওপরই নির্ভর করে তাদের 'জীবন-সংসার'। ফলে তাদের মধ্যে কাজ করেছে 'গোপন ভয়'। ইয়াকুবও এই সুযোগটাই নিয়েছে এবং রুষ্ট হয়েছে তাদের বৈধ বেতন প্রার্থনায়। এসময় নামকাওয়াস্তে কিছু টাকা (পনেরো টাকা) দিয়ে আপাত তাদেরকে বিদায় করে দিলেও সে তার মনের মধ্যে পুষে রেখেছিল রুষ্টতা। এই রুষ্টতাবশতই সে হেডমাস্টার মনসুরের সহায়তায় মজিদকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দিয়েছে। অপরাধ হিসেবে দাখিল করেছে 'বয়স'কে । অর্থাৎ লঘু পাপে গুরু দণ্ড। আসল কারণ জানা যায় মনসুরের সংলাপে : 'আমি কলিমকেও জবাব দিতাম। কিন্তু ওকে আমার দরকার। ওর বয়স কম, উদ্যমী– ভাবছি এ যাত্রা ওয়ারনিং দিয়ে ছেড়ে দেব। যে জঘন্য কাজ আপনারা করছেন তার তুলনা হয় না।'[১৯] মূলত ইয়াকুবের কাছে আড়াই মাসের পাওনা মাইনে চাইতে যাওয়াই মনসুরের দৃষ্টিতে 'জঘন্য কাজ'– যার শাস্তি মজিদকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা এবং কলিমকে 'ওয়ারনিং' দেওয়া। ইয়াকুব জমিদার এবং তার পক্ষপুটচ্ছায়ায় পুষ্ট স্বার্থান্বেষী হেডমাস্টার মনসুরের এই 'বিধান' নির্ধারণ করার উদ্দেশ্য– যাতে আর কোনো শিক্ষক পাওনা মাইনে চাইতে ইয়াকুবের দারস্থ না-হয়। না-হলেই তারা নির্বিঘ্নে স্কুলের অর্থ আত্মসাৎ করবে– যে অর্থে বজায় থাকবে ইয়াকুবের জমিদারি ঠাট– সর্বোপরি পাওনা মাইনে না-পেয়ে এবং শোষণ সহ্য না-করে একসময় স্কুল শিক্ষকরা চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। আস্তে আস্তে বন্ধ হবে গ্রামের স্কুল। চাষাভূষোর সন্তানরা আর শিক্ষিত হবে না এবং শিক্ষিত না-হলে তারা আর আন্দোলন-সংগ্রাম করবে না। ফলে সামন্তশ্রেণি নির্বিঘ্নে অব্যাহত রাখবে 'শোষণপ্রক্রিয়া'– যে শ্রেণির প্রতিনিধি ইয়াকুবের মনস্কামও ছিল এটাই। মূলত সে কখনোই চায়নি যে চাষাভূষোর সন্তানরা শিক্ষিত হোক। কারণ, সে জানত চাষাভূষোর সন্তানরা শিক্ষিত হলে একসময় প্রতিবাদী হয়ে উঠবে। এজন্যই সে কলিম মাস্টারকে বলেছিল : 'এই চাষাভূষোর ছেলেরা দু'কলম পড়ে আজ বাদে কাল চোখ রাঙাতে আসবে, সে আর আমি জানিনে– খুব জানি।' এই 'চোখ রাঙানো' তথা সামন্তশ্রেণির প্রতি প্রতিবাদী হওয়া থেকে বিরত রাখার প্রয়োজনেই মজিদকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা এবং কলিমকে 'ওয়ারনিং' দেওয়া। উল্লেখ্য যে, মডার্ন হাই স্কুলের নবনিযুক্ত শিক্ষক এবং মজিদ মাস্টারের ভাগ্নে কামালও তিন মাসের মধ্যেই উপলব্ধি করে ইয়াকুবের অধীনে আত্মসম্মান অক্ষুণ্ন রেখে চাকরি করা অসম্ভব। তাই সে মডার্ন হাই স্কুলের শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে নতুন চাকরির প্রত্যাশায় চলে যায় দিনাজপুরে। মূলত, মজিদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা, কলিমকে ওয়ারনিং দেওয়া এবং কামালকে চাকরি ছেড়ে যেতে বাধ্য করার মূল উদ্দেশ্য চাষাভূষোর সন্তানদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা। অপরদিকে এই চাষাভূষোর সন্তানদের শিক্ষিত করাই ছিল মজিদ মাস্টারদের মতো বিবেকীমানুষের মূল উদ্দেশ্য– যার সাক্ষ্য মেলে কলিম মাস্টারের সংলাপে, 'স্কুল না করলে গরীবের ছেলেপুলেরা যে উচ্ছন্নে যেতো।' মূলত এই গরিব তথা চাষাভূষোর সন্তানদের 'উচ্ছন্নে যাওয়া' কিংবা নিখিল পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৬.০৯.১৯৫০) শিক্ষাসম্পর্কীয় রিপোর্টে পেশকৃত 'ছাত্ররা ত' বোনার পাড়ায় কুলিগিরি করে। কেউবা হয়েছে ছিঁচকে চোর'– এই দশা বিরত রাখাই ছিল তাদের প্রধান ব্রত– যে ব্রতের প্রধান ব্রতী বক্ষ্যমাণ নাটকের মজিদ মাস্টার। ফলে দেখা যায়, সংসারে যখন নিত্য অভাব-অনটন বিরাজ করছে তখনও সে সবকিছু ভুলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে পরীক্ষার খাতা :

কলিম : কি রকম দেখছো?

মজিদ : আর বলো না– পাতায় পাতায় লাইনে লাইনে ভুল! আর হবে না কেন– সারাটা বছর বই এর সঙ্গে টুঁ সম্পর্কটি আছে?

কলিম : তোমার তবু ইতিহাস, না পারি আন্দাজই সই। কিন্তু ভূগোলের বেলায় আর সেটি চলবে না। বল, এখন কায়রোকে যদি সিংহলের রাজধানী করতে হয়।

মজিদ : থামো থামো (একটা খাতা বার করে) এ– এ– না– হ্যাঁ– এই– এই যে; দেখ হে দেখ, কি সব রত্নচূড়ামণি। লিখেছে 'চাণক্যের পুত্র শিবাজী, পানিপথের তৃতীয় সমরে চন্দ্রগুপ্তের নিকট পরাজিত হইয়া মেসিডনে চলিয়া যান।' এখন বল করবেটা কী?

কলিম : অন্ধকার, অন্ধকার ভবিষ্যৎ অন্ধকার![২০]

লক্ষণীয়, রাষ্ট্রপরিচালকগণের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে মুখ্য স্থান না-দিয়ে দেশরক্ষার অজুহাতে বিদ্যাকেন্দ্রগুলো হুকুম-দখল করে রাখা, 'ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা' পরিবর্তনসাধনের উদ্যোগ না-নেওয়া, অর্থাভাবে মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়া, সরকারি স্কুল-কলেজগুলোতে শিক্ষককে যতদিন খুশী অস্থায়ী পদবাচ্য করে রাখা, দীর্ঘদিন গরিব শিক্ষকদের মাইনে বাকি ফেলে রাখা, হিন্দু শিক্ষকদের পশ্চিমবঙ্গে চলে যাওয়া, সর্বোপরি ইয়াকুব জমিদার এবং তার পক্ষপুটচ্ছায়ায় পুষ্ট হেডমাস্টার মনসুরের মতো স্বার্থান্বেষী-অর্থলোভী মানুষের কারণে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক ছাঁটাই হতে থাকা প্রভৃতি কারণে এ দেশের শিক্ষার অবস্থা যে দশায় পরিণত হয়েছিল, তা নাট্যকার সুনিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন এই সংলাপে। উল্লেখ্য যে, এই সংলাপগুলো কেবল পাকিস্তান অধীন বাংলাদেশের (১৬.০২.১৯৫০-১৬.০৫.১৯৫১) শিক্ষাসংকটের পরিচায়ক নয়, বরং মজিদের কর্মনিষ্ঠারও পরিচিতি। যে সবসময় চেয়েছে 'অন্ধকার, অন্ধকার ভবিষ্যৎ অন্ধকার!'– তথা ১৪.০৯.১৯৫০ তারিখে 'নওবেলাল'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধের 'আগত সমাজের মানবগোষ্ঠীর ভবিষ্যত অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে' থেকে দেশকে মুক্ত করতে, কিন্তু 'সংসার' নামক জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে দ্বারস্থ হয়েছে জমিদার এবং স্কুল-সেক্রেটারি ইয়াকুবের। বিধানমোতাবেক ভোগ করেছে শাস্তি। হারিয়েছে চাকরি। কিন্তু কলিম মাস্টার– তার তো কোনো সংসার ছিল না, সে কি পেরেছে? হয়তো সে 'ওয়ারনিং' পেয়েই নিঃশব্দ-নীরব হয়ে গেছে! নবীন শিক্ষক কামাল তো আর নীরব থাকেনি, কিন্তু সে কি পেরেছে? নাট্যঘটনায় দেখা যায়, মাত্র তিন মাসের শিক্ষকতাজীবনে সে উপলব্ধি করে ইয়াকুবের অধীনে আত্মসম্মান অক্ষুণ্ন রেখে চাকরি করা অসম্ভব। তাই সে স্বেচ্ছায় মডার্ন হাই স্কুলের শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়েছে, তবুও সে স্বপ্ন দেখেছে নতুন দিনের:

রানু : চলে যাচ্ছ মানে?

কামাল : না গিয়ে উপায়? মর্যাদা নিয়ে এখানে চাকরি করা চলে? আসলে স্কুল তো নয় বাপের জমিদারী। যাচ্ছে তাই কাণ্ড চলছে সব।

রানু : তোমরা সকলে বাধা দিলে পার।

কামাল : এই তিনটা মাস সে চেষ্টাই করেছি। কিন্তু একা তুমি কি করবে? স্কুলের জন্য ইয়াকুব মিয়ার কেন এই অন্তহীন দরদ তাও জানি। কিন্তু গলা ফাটিয়ে বলো, কেউ বিশ্বাস করবে না– কাগজে ছাপতে দাও– কেউ ছাপবে না। তাই–

রানু : তাই কি?

কামাল : ভাবছি এ চরম ব্যর্থতার দিনগুলোই সব নয়। এরপরও দিন আছে। সেদিন– সেদিন শুধু আমি নই আমার মতো আরো অনেকে আসবে, তাদের সকলের দুর্বার শক্তির কাছে এদের একদিন পরাজয় মানতে হবে। ... ভেবেছিলাম মাস্টারী আর করব না। মনে হল সেও এক রকম পরাজয়– সে পরাজয় মেনে নিলে মনকে প্রবোধ দেবার আর কিছু থাকে না। আপাতত দিনাজপুরে একটা চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা–[২১]

লক্ষণীয়, কামালের সংলাপে 'এ চরম ব্যর্থতার দিনগুলোই' মূলত ১৪.০৯.১৯৫০ তারিখে 'নওবেলাল'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধের 'জাতীয় দুর্দিন'-এর নামান্তর। যেখানে 'আমাদের রাষ্ট্র পরিচালকগণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে মুখ্য স্থান না দিয়া দেশ রক্ষার অজুহাতে বিদ্যাকেন্দ্রগুলি হুকুম দখল করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছেন না'– এর মর্মবাণীই মুদ্রাঙ্কিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মডার্ন হাই স্কুলে সেক্রেটারি জমিদার ইয়াকুব ছাড়াও ম্যানেজিং-কমিটিতে রয়েছে নাগর আলী, টিম্বার মার্চেন্ট সালামত মিয়া– যাদের রয়েছে নাম-বেনামের ব্যবসা; আর আছে প্রথম শ্রেণির ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার ওসমান শেখ। মূলত এদের 'হুকুম-দখলে'র রাজত্ব এই স্কুল। ফলে ইয়াকুব মিয়ার স্কুলের প্রতি 'অন্তহীন দরদ' তথা অর্থ-আত্মসাৎ কিংবা 'হুকুম-দখলে'র রাজত্বের কথা কামাল মাস্টার একা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না, এমনকি কাগজে ছাপতে গেলেও কেউ ছাপবে না– এটাই স্বাভাবিক। এই 'অস্বাভাবিক স্বাভাবিকতা' যখন একটা বিদ্যাকেন্দ্রে বিরাজ করে তখন সেটাকে শিক্ষাপরিবেশের 'চরম ব্যর্থতার দিন' হিসেবেই পরিগণন করা শ্রেয়– যে ব্যর্থতা ঘুচার স্বপ্ন দেখে কামাল। বিশ্বাস করে– একদিন তার মতো আরো অনেকে আসবে এবং তাদের সম্মিলিত দুর্বার শক্তির কাছে ইয়াকুবরা পরাজিত হবে। মুক্ত হবে বিদ্যাকেন্দ্র। এই স্বপ্ন নিয়েই সে চাকরি ছেড়ে দিয়েছে এবং নতুন স্কুলে চাকরির প্রত্যাশায় চলে গেছে দিনাজপুর। মূলত সে 'জাতীয় দুর্দিন' থেকে মুক্তির জন্যই পুনরায় শিক্ষকতাকে ব্রত হিসেবে বেছে নিয়েছে। কারণ, তার কাছে মনে হয়েছে, শিক্ষকতা ভিন্ন অন্যকিছু করা গ্রহণ– 'এক রকম পরাজয়– সে পরাজয় মেনে নিলে মনকে প্রবোধ দেবার আর কিছু থাকে না।' স্মর্তব্য, কামাল মাস্টার যেহেতু বয়সে তরুণ এবং অবিবাহিত, সেহেতু যত সহজে সে ইয়াকুবের অধীনে আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে চাকরি করা অসম্ভব মেনে নিয়ে চাকরি ছেড়ে দিয়েছে, ঠিক ততটাই কঠিন ছিল মজিদ মাস্টারের জন্য। কারণ, মজিদ বয়সে প্রবীণ এবং তার একা-উপার্জনের ওপরই নির্ভর করে পাঁচসদস্যবিশিষ্ট পরিবার। এজন্য পোষ্যভারাক্রান্ত প্রবীণ মজিদ ইয়াকুবের অধীনে আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করে চাকরি করাকে শ্রেয়জ্ঞান করেছে। ফলে হেডমাস্টার মনসুর যখন তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার কথা ব্যক্ত করে, তখন তার কণ্ঠে মিনতি ভাবই দৃষ্ট হয়:

মজিদ : দেখুন আমার বিরাট সংসার– ছেলে, মেয়ে, বৌ। আমি বেকার হলে ওদের যে পথে বসতে হবে। ছেলেটা– ছেলেটাও মানুষ হয়নি। আপনি বোধ হয় এসব জানেন না– মানে আমার পারিবারিক সব সমস্যার কথা। কেমন করে জানবেন? আমিও কি আর কোনদিন বলেছি। ... এ বয়সে আমি কি করব– কোথায় যাব? ভিক্ষে করব? কেমন করে করতে হয় তাত জানিনে– আপনি দয়া করুন। দেখুন মাইনে কমিয়ে– খুব কমিয়েও কি আমাকে রাখা যায় না![২২]

এই বিনীত প্রার্থনাসূচক সংলাপের মধ্যেই মজিদের পোষ্যভারাক্রান্ততার পরিচয় নিহিত– যার জন্যই তার আপসকামিতা। উল্লেখ্য যে, মজিদের এই বিনীতপ্রার্থনাতেও যখন হেডমাস্টার মনসুরের মনে কোনো সহানুভূতির উদ্রেক হয় না, তখন তার মনে জেগে ওঠে 'শিক্ষকসত্তা'– হয়ে ওঠে 'দুঃসাহসিক এবং প্রতিবাদী'। ফলে হেডমাস্টার তাকে বকেয়া বেতন পরিশোধের আশ্বাস দিলে সে তা প্রত্যাখ্যান করে– সর্বোপরি ঘৃণামিশ্রিত দৃঢ়কণ্ঠে জানিয়ে দেয় :

মজিদ : মনসুর সাহেব, জীবনের সব কিছু থেকে যখন বঞ্চিত হয়েছি– তখন এ সহানুভূতিতেও কাজ নেই। বকেয়া মাইনের জন্য আমি আসব না।

মনসুর : সে আপনার ইচ্ছে। না আসেন 'পুওর ফাণ্ড'-এ দিয়ে দেব– তবু একটা মহৎ কাজে লাগবে। [মজিদ চলে যাচ্ছিল]

নায়েব : ওকি মাস্টার উঠছো, হুজুরকে একটা সালাম পর্যন্ত করলে না?

মজিদ : অন্ততঃ ঐ একটা কাজ না করে বিদায় নিতে পারছি, এটাই একমাত্র সান্ত্বনা নায়েব। তোমার হুজুরকে বলো পনেরোটা বছর শুধু ঘাড় নিচু করেই চলেছি– আর নয়। তোমার হুজুরের তোষামুদের অভাব নেই, লিস্টিতে একজন না হয় বাদই পড়ল।[২৩]

এই সংলাপ মজিদের 'দুঃসাহসিক এবং প্রতিবাদী' রূপ 'শিক্ষকসত্তা'রই পরিচায়ক। উল্লেখ্য, জীবনের এই অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থায় শিক্ষকতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে মজিদ এবং অভাবসংকুলসংসারের খরচ যোগাতে করিম বক্সের মুদির দোকানে হিসাবরক্ষকের কাজ করতে আগ্রহী হয়। কিন্তু সেখানেও সে প্রত্যাখ্যাত হয়। গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় তাকে এবং উপহাসভরে জানায় : "মাস্টার' লাভ লোকসানের হিসেব, এত বড় কঠিন ব্যাপার– যাকে তাকে তো নিতে পারিনে।'[২৪] সামান্য মুদির দোকানির বিদ্রুপ, পরিবারের প্রতি যথাযথ কর্তব্য পালন করতে না-পারার ব্যর্থতা, সামাজিক লাঞ্ছনা– সর্বোপরি মানসিক উৎপীড়নে বিক্ষুব্ধ ও হতাশ হয়ে নিরুদ্দেশ হয় মজিদ। এভাবে নাট্যকার মজিদ চরিত্রের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান অধীন বাংলাদেশের (১৬.০২.১৯৫০-১৬.০৫.১৯৫১) ছাঁটাই হওয়া শিক্ষকের দুর্বিষহ জীবন শিল্পিত করেছেন– যে জীবন ১৪.০৯.১৯৫০ তারিখে 'নওবেলাল'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধের 'কংকালসার শিক্ষকেরা ধীরে ধীরে তাহাদের জীবনীশক্তি হারাইয়া ফেলিতেছেন'– জীবনেরই বাস্তবরূপায়ণ; কিংবা নিখিল পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৬.০৯.১৯৫০) শিক্ষাসম্পর্কীয় রিপোর্টে বর্ণিত বগুড়ার সুখানপুকুরের প্রাইমারি শিক্ষকের জীবনের রূপায়ণ– যার সম্পর্কে বলা হয়েছিল, 'মনে রাখতে হবে তিনি স্বাধীন রাষ্ট্রের একজন শিক্ষক এবং ভদ্রলোক।' বস্তুত ছাঁটাই হওয়া শিক্ষক মজিদের দুর্বিষহ জীবনকে আরো বেদনার্ত দেখানোর প্রয়োজনে নাট্যকার অষ্টম এবং নবম দৃশ্য সংযোগ করেছেন। অষ্টম দৃশ্য– যেখান চিত্রিত হয়েছে পাঁচ বছর পরের ঘটনা। এখানেই শহরের এক পোস্ট অফিসের বারান্দায় পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অন্যের চিঠিপত্র লেখার কাজে ব্যস্ত মজিদকে দেখা যায়। এই দীর্ঘ পাঁচ বছর ছাঁটাই হওয়া শিক্ষক মজিদের দুর্বিষহ জীবনযাপনের ফলে তার চেহারায় পরিদৃষ্ট হয় ব্যাপক পরিবর্তন– যা দেখে তার পুত্র আমিনও তাকে চিনতে ব্যর্থ হয়েছে। অতঃপর অতিকষ্টে পিতাকে চিনতে সক্ষম হয়ে অনুরোধ করেছে তার পরিবারে ফিরে যেতে। কিন্তু পুত্রের শত অনুরোধ অগ্রাহ্য করেছে সংসারবীতশ্রদ্ধ অভিমানী মজিদ। অবশেষে আমিন তার স্ত্রী রোকেয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে মজিদ পুত্রপরিবারে প্রত্যাবর্তনে সম্মত হয়। এসময় সে পিতাকে জানিয়ে দেয় তাকে আর কোথাও যেতে দেবে না। মজিদও হয়তো মনে মনে ভেবেছিল বাকিজীবনটা পুত্রপরিবারেই কাটিয়ে দেবে, কিন্তু আমিনের অনুপস্থিতিতে পুত্রবধূ কথায় সম্বিত ফিরে পায় সে :

| | | |
|---|---|---|
| রোকেয়া | : | এতটা বছর কেটে গেল। শ্বশুর-শাশুড়ীর মুখ দেখতে পেলাম না। কি কপাল নিয়েই যে এসেছিলাম। এতটা দিন গেল বাবা, ছেলের বউকে দেখার ইচ্ছে একবার হল না। এবার কিন্তু আপনাকে সহজে ছাড়ছিনে– |
| মজিদ | : | তুমি দেখছি মা, আমার পাগলাটে ছেলেরই জুড়ি। ও সে কথাই বলছিল। বৌমা– বলছিল আর কোথাও আমাকে যেতে দেবে না– |
| রোকেয়া | : | সত্যিই তো, ওর বুঝি দুঃখ হয় না। এবার কিন্তু বেশ ক'টা দিন আপনাকে বেড়িয়ে যেতে হবে। কাজের ক্ষতি হ'ক, অন্তত তিন-চারটে দিন কাটিয়ে যেতেই হবে। |
| মজিদ | : | কি বললে মা? |
| রোকেয়া | : | বেশী দিনতো নয়। তিন চারটে দিন। তাও থাকতে নেই? আমরা কি বাবা পর?[২৫] |

পুত্রবধূর এরূপ শরসম বাক্য বিদ্ধ করে বৃদ্ধ মজিদের বক্ষ। কেননা, পুত্রের কথায় নয়, বরং পুত্রবধূর কথা শুনেই সংসারবীতশ্রদ্ধ মজিদ ফিরে এসেছিল সংসারজীবনে– অথচ তারই এমন ব্যবহারে পুনরায় মন ভাঙে তার। অতঃপর আত্মসম্মান রক্ষা করাই শ্রেয়জ্ঞান করে মজিদ পুনরায় হয়েছে নিরুদ্দেশ এবং দুর্বিষহ জীবনের গ্লানিমোচনের নিমিত্ত আশ্রয় খুঁজেছে রবীন্দ্রনাথে। পাঠ করেছে তাঁর অমরকবিতাখানির দুটি পঙ্‌ক্তি: 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই না, ছোট সে তরী/ আমারই সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।'[২৬] অর্থাৎ মজিদের 'সোনার ধানে' 'সোনার তরী' ভরে উঠলেও সে তরীতে তিলঠাঁই হয়নি তার। ফলে সে গেছে রিক্তহস্তে দিগন্তের পথে। স্মর্তব্য,

নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে খাজনা আদায় প্রসঙ্গে নায়েব জমিদারকে জানিয়েছিল, 'হুজুর গায়ের শক্ত-সমর্থ লোক সবাই শহরে কাজ করে। মাসে মাসে তারা টাকা পাঠায়'[২৭]– যার মাধ্যমে নাট্যকার কৌশলে জানিয়ে দেন জীবিকার সন্ধানে গ্রামের মানুষের শহরমুখী হওয়ার সংবাদ (যেখানে দৃষ্ট হয়েছে ১৬.০২.১৯৫০-১৬.০৫.১৯৫১ অন্তর্বর্তীকালীন পূর্ববঙ্গীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজ)। ভেবে নেওয়া অসঙ্গত নয় যে, এই গ্রাম্য লোকেরা মূলত শহরে গিয়ে সদ্য গড়ে ওঠা মিল-কারখানায় শ্রমিক হিসেবেই কাজ করে– যেটি বোধগম্য করতেই নাট্যকার 'গায়ের শক্ত-সমর্থ লোক' কথাটি ব্যবহার করেছেন। যার মাধ্যমে নাট্যকার কৌশলে জানিয়ে দেন যে, পূর্বপাকিস্তানের (বাংলাদেশ) সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি পরিবর্তিত হয়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতির রূপ গ্রহণ করছে। উল্লেখ্য, এসময় এই শহরমুখী মানুষের কেউ কেউ হয়তো শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছিল। দীর্ঘ পাঁচ বছর পরের ঘটনাসংবলিত অষ্টম এবং নবম দৃশ্যের মজিদপুত্র আমিন তাদেরই একজন। বস্তুত এসময় বাংলাদেশে সদ্য বিকশিত হয়েছে পুঁজিবাদী সমাজ– যে সমাজ নগ্নস্বার্থ আর নির্মম নগদ লেনদেন ছাড়া আর কোনো মানবিক বন্ধন অবশিষ্ট রাখেনি। মূলত–

> বুর্জোয়া শ্রেণী যেখানেই প্রাধান্য পেয়েছে, সেখানেই সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক, পিতৃতান্ত্রিক ও প্রকৃতি-শোভন সম্পর্ক শেষ করে দিয়েছে। যে সব বিচিত্র সামন্ত বাঁধনে মানুষ বাঁধা ছিল তার স্বভাবসিদ্ধ ঊর্ধ্বতনদের কাছে, তা এরা ছিঁড়ে ফেলেছে নির্মমভাবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের অনাবৃত স্বার্থের বন্ধন, নির্বিকার 'নগদ টাকার' বাঁধন ছাড়া আর কিছুই এরা বাকি রাখেনি। ... লোকের ব্যক্তি-মূল্যকে এরা পরিণত করেছে বিনিময় মূল্যে, অগণিত অনস্বীকার্য সনদবদ্ধ স্বাধীনতার স্থানে এরা এনে খাড়া করল ওই একটিমাত্র নির্বিচার স্বাধীনতা– অবাধ বাণিজ্য। ... বুর্জোয়া শ্রেণী পরিবারপ্রথা থেকে তার ভাবালু ঘোমটাটাকে ছিঁড়ে ফেলেছে, পারিবারিক সম্বন্ধকে পরিণত করেছে নিছক আর্থিক সম্পর্কে।[২৮]

কার্যত, বাংলাদেশে সদ্য বিকশিত পুঁজিবাদী সমাজের এই নগ্নরূপ দেখাতেই নাট্যকার শেষদৃশ্যে আমিনপত্নী রোকেয়াকে সৃজন করেছেন– দেখিয়েছেন তার পারিবারিক সম্বন্ধবিমুখ অনাবৃত স্বার্থবাদী আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতা– যে মানসিকতার উলঙ্গ বহিঃপ্রকাশ দেখে আত্মসম্মানী মজিদ পুনরায় হয়েছে নিরুদ্দেশ। অপরদিকে আমিন– যে পিতৃতান্ত্রিক ও প্রকৃতিশোভনসম্পর্ক– সর্বোপরি নিঃস্বার্থ পারিবারিক সম্বন্ধকে (সামন্তসমাজের বৈশিষ্ট্য) বজায় রাখতেই বৃদ্ধপিতা মজিদকে তার পরিবারে স্থান দিয়েছে। কিন্তু সে তাকে ধরে রাখতে পারেনি, পারেনি তার স্ত্রীর স্বার্থবাদী আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতার জন্যই। উল্লেখ্য, আমিনের অবর্তমানে মজিদ চলে গেলেও এমন ভাবনা ভাবা সমীচীন নয় যে, তার বর্তমানে মজিদ নিরুদ্দেশ হতো না– হয়তো দুদিনবাদে হতো, কিন্তু হতোই। কারণ, অর্থনীতি সমাজের মৌল কাঠামো, সংস্কৃতি উপরি কাঠামো। মৌল কাঠামো অর্থনীতি পরিবর্তিত হলে উপরি কাঠামো সংস্কৃতিও অনিবার্যশর্তে পরিবর্তিত হতে বাধ্য। *মানচিত্র* নাটকের শেষ দুটি দৃশ্যে চিত্রিত সমাজের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। কাজেই রোকেয়ার– 'বেশী দিনতো নয়। তিন চারটে দিন। তাও থাকতে নেই? আমরা কি বাবা পর?'– এমন ব্যবহার, যেখানে বৃদ্ধ মজিদকে শ্রদ্ধার সাথে শ্রাদ্ধ করার ঘটনা আকস্মিক কোনো ব্যাপার নয়, বরং তা সদ্য বিকশিত পুঁজিবাদী সমাজেরই নগ্নরূপ। অপরদিকে আমিনের বৃদ্ধ পিতাকে পরিবারে রাখতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা নয়, বরং তা সামন্তসমাজের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রাখাই প্রচেষ্টা। এই দিক থেকে নাটকটির অন্তর্স্রোত রাশিয়ান নাট্যকার আন্তন চেখভের (Anton Pavlovich Chekhov; ১৮৬০-১৯০৪) *দ্য চেরি অর্চার্ড* (১৯০৪) নাটকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আন্তন চেখভ এই নাটকে রাশিয়ার কৃষি যুগের (agrarian age) [যা সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত] ভাঙন এবং বাণিজ্যিক ও শিল্প যুগের (commercial and industrial age) [যা বুর্জোয়া অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত] উত্থানের বাস্তবচিত্র শিল্পিত করেছেন : 'The play (*The Cherry Orchard*) symbolises, poetically, yet without ever losing touch with reality, the transition from a purely agrarian to a more and more

industrial Russia.'[২৯] এখানে চেরি বাগান মূলত রাশিয়ার প্রতীক– যার মালিক মাদাম লুভ আন্দ্রিয়েভনা র‍্যানেভস্কি। এখানে র‍্যানেভস্কি মূলত সামন্তসমাজের প্রতিনিধি– যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে চেরি বাগানটিকে নিলামের হাত থেকে রক্ষা করতে। সে চাইলে লোপাখিনের পরামর্শ মোতাবেক চেরি বাগান কেটে গ্রীষ্মকালীন কটেজ তৈরি করে ভাড়া দিতে পারত। তাতে রক্ষা হতো চেরি বাগানসহ সমস্ত সম্পত্তি। কিন্তু সে তা করেনি। কারণ, এই চেরি বাগানের সাথে জড়িয়ে আছে তার সমস্ত শৈশবস্মৃতি:

> MADAME RANEVSKY : (*Looking out into the garden*) Oh, my childhood, my pure and happy childhood! I used to sleep in this nursery. I used to look out from here into the garden. Happiness awoke with me every morning! and the orchard was just the same then as it is now; nothing is altered. (*Laughing with Joy*) It is all white, all white! Oh, my cherry orchard![30]

তাছাড়া এখানেই রয়েছে তার পূর্বের স্বামী এবং একমাত্র পুত্র গ্রিসার স্মৃতি– যারা কেউ জীবিত নেই। ফলে সে তার আজন্মস্মৃতিবিজড়িত চেরি বাগান কাটতে কোনোভাবেই সম্মত হয় না, বরং তা রক্ষার জন্য সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করে। কিন্তু রক্ষা হয় না প্রিয় চেরি বাগান। নিলামে ওঠে– যেখান থেকে বাড়ি, চেরি বাগানসহ সমস্ত সম্পত্তি ক্রয় করে নেয় এই সমাজেরই (সামন্তসমাজ) উঠতি পুঁজিপতির প্রতিনিধি লোপাখিন এবং আনন্দে আত্মহারা হয়ে চেরি বাগান কেটে গ্রীষ্মকালীন কটেজ তৈরির প্রস্তুতি গ্রহণ করে। একদিকে সামন্তসমাজের প্রতিনিধি র‍্যানেভস্কির বোবাকান্না অপরদিকে ব্যবসায়িক বুদ্ধিসম্পন্ন লোপাখিনের হাসি মহিমান্বিত করে নাটকটিকে। স্মর্তব্য, র‍্যানেভস্কির কন্যা অ্যানওয়ার অনুরোধে লোপাখিন বাগান কাটা সাময়িক বন্ধ রাখলেও তারা যখন ট্রেনে চেপে প্যারিসের উদ্দেশ্যে রওনা হয় ঠিক তখনই লোপাখিন বাগান কাটতে আরম্ভ করে– যার শব্দে কম্পিত হয় আকাশ : 'A distant sound is heaed, as if from the sky, the sound of a string breaking, dyning away, melancholy. Silence ensues, broken only by the stroke of the axe on the trees far away in the cherry orchard.'[৩১] আকাশে ভেসে আসা 'string breaking' বা মটকিয়ে ভাঙার শব্দ এবং চেরি বাগান কাটা তথা ভাঙার শব্দই মূলত রাশিয়ার সমাজের ভাঙন। আন্তন চেখব তাঁর *দ্য চেরি অর্চার্ড* নাটকে এই শেষ বাক্যটি সংযোগের মধ্য দিয়ে রাশিয়ার সামন্তযুগের ভাঙন এবং বাণিজ্যিক-শিল্পযুগের [যা বুর্জোয়া অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত] উত্থানের ইঙ্গিত দিয়েছেন। অর্থাৎ পুরোনো সমাজব্যবস্থা ভেঙে যাচ্ছে, আসছে এক নতুন জীবন, নতুন সমাজ। যেখানে জয়ী লোপাখিন। কারণ, সে রাশিয়ার সদ্য উত্থিত বুর্জোয়া অর্থনীতির প্রতিনিধি। আনিস চৌধুরীও তাঁর *মানচিত্র* নাটকে শেষদৃশ্য সংযোগের মধ্য দিয়ে সামন্তসমাজের বিনাশ এবং পুঁজিবাদীসমাজের সদ্য বিকাশ– এ দুয়ের অন্তর্বর্তীকালীন পূর্ববঙ্গীয় সমাজের দ্বন্দ্ব চিত্রিত করেছেন আমিন এবং রোকেয়ার মাধ্যমে। এক্ষেত্রে জয়ী– রোকেয়া। কারণ, সে বাংলাদেশে সদ্য বিকশিত পুঁজিবাদী সমাজেরই প্রতিনিধি। উল্লেখ্য যে, আন্তন চেখভের *দ্য চেরি অর্চার্ড* নাটকের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র পিটার ট্রফিমফ রাশিয়ায় সংস্কারবাদী রাজনৈতিক মতামতের ক্রমবর্ধমান জোয়ারের (বামপন্থী রাজনীতির) প্রতিনিধিত্বকারী চরিত্র।[৩২] রাশিয়ায় সামন্তসমাজের বিনাশ এবং পুঁজিবাদী সমাজের সদ্য উত্থানের মধ্যেও সে স্বপ্ন দেখেছে সমাজতান্ত্রিক সমাজের– যে স্বপ্ন সে জানিয়েছে তার প্রেমিকা অ্যানওয়াকে :

> TROPHIMOF : ... every minute, day and night, my soul has been full of mysterious anticipations. I feel the approach of happiness, Anya; I fell it coming...[33]

আনিস চৌধুরীর *মানচিত্র* নাটকের কামালের মধ্যেও এই 'স্বপ্ন' দেখা যায়। সেও ট্রফিমফের মতো তার প্রেমিকা রানুকে জানিয়েছে সেই স্বপ্নকথা :

> কামাল : ... সামান্য দু'মুঠো অন্নের সংস্থান যদ্দিন না হয় তদ্দিন একশ্রেণীর মানুষ আমাদের

ভাগ্য নিয়ে চিরকালই এমনি খেলা খেলে চলবে–

রানু : এর কি শেষ নেই?

কামাল : অমন নৈরাশ্যবাদী আমি নই। বলবে, এ আমার স্বপ্ন– কিন্তু জানি, এ স্বপ্ন একদিন সফল হবে।[৩৪]

বস্তুত কামালের 'এ স্বপ্ন একদিন সফল হবে' এবং ট্রফিমফের 'I fell it coming...' স্বপ্নই মূলত সমাজতান্ত্রিক সমাজের স্বপ্ন। ট্রফিমফের 'coming' স্বপ্ন রাশিয়ায় বাস্তবায়িত (came true) হলেও আজও অপূর্ণই রয়ে গেছে কামালের স্বপ্ন। কিন্তু পরিপূর্ণ হয়েছে 'রোকেয়া'দের স্বপ্ন– যাদের দৌত্যিক দৌরাত্ম্যে সোনার ধানে সোনার তরী ভরিয়ে তোলা 'মজিদ'দের ঠাঁই আজ 'সোনার তরী'তে নয় 'বৃদ্ধাশ্রমে'। কার্যত, এভাবে সমাজ ও জীবনকে চিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে আনিস চৌধুরীর সমাজজীবনসম্পর্কিত সুস্থ, পরিচ্ছন্ন ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় পাওয়া যায়।

## ৪. উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতিভাস হয় যে, *মানচিত্র* কেবল 'শিক্ষিত মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের'[৩৫] রূপায়ণ নয়, বরং পাকিস্তান-অধীন বাংলাদেশের শিক্ষাসমস্যা– বিশেষত শিক্ষকদের বেতন না-দেওয়া, বিভিন্ন অজুহাতে শিক্ষক ছাঁটাই করা– সর্বোপরি ছাঁটাই হওয়া শিক্ষকের দুর্বিষহ জীবনের 'মানচিত্র'। যে দুর্বিষহ জীবনকে ব্যাখ্যার প্রয়োজনে নাট্যকার মধ্যবিত্তজীবনঅনুষঙ্গকে রূপায়ণ করেছেন। কারণ, এদেশের অধিকাংশ শিক্ষকই মূলত মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির। উল্লেখ্য, নাট্যকার এই নাটকে শিক্ষাঙ্গনে ভোগ-দখলের রাজত্ব দর্শনের প্রয়োজনে যেমন ইয়াকুব জমিদার এবং তার পক্ষপুটচ্ছায়ায় পুষ্ট স্বার্থান্বেষী হেডমাস্টার মনসুরের স্বার্থবাদী রূপ চিত্রণ করেছেন, কিংবা সদ্য বিকশিত পুঁজিবাদী সমাজের পারিবারিক সম্বন্ধবিমুখ অনাবৃত স্বার্থবাদী আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতা দেখানোর প্রয়োজনে যেমন শেষদৃশ্যে রোকেয়াকে সৃজন করেছেন, ঠিক তেমনি ছাঁটাই হওয়া শিক্ষকের দুর্বিষহ জীবনের ব্যাখ্যার প্রয়োজনে রূপায়ণ করেছেন মধ্যবিত্তজীবনঅনুষঙ্গ। এর অধিক কিছু নয়। অতএব বলা যায় যে, মানচিত্র 'শিক্ষিত মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের' রূপায়ণ নয়, বরং এদেশের সামন্ত সমাজের ভাঙন এবং পুঁজিবাদী সমাজের উত্থান, শিক্ষাসমস্যা– সর্বোপরি শিক্ষকদের দুর্বিষহ জীবনের 'মানচিত্র'।

## টীকা ও তথ্যনির্দেশ

---

১ সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, *ইতিহাসের দিকে ফিরে : ছেচল্লিশের দাঙ্গা* (কলকাতা : র‍্যাডিকেল, জানুয়ারি ২০০০), পৃ. ২২

২ বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*-৩ (ঢাকা : সুবর্ণ, ২য় মুদ্রণ, সেপ্টম্বর ২০১৭), পৃ. ৬৫

৩ 'The purpose of the permanent Zamindari settlement was to create a new class of landlords after the English modle as the social buttress of English rule. It was recognised that, with the small numbers of English, holding down a vast population, it was absolutely necessary to establish a social basis for their power through the creation of a new class whose interests, through receiving a subsidiary share in the spoils (one-eleventh, in the original intention), would be bound up with the maintenance of English rule. Lourd Cornwallis, in the memorandum in which he defended his policy, made clear that he was explicitly conscious that he was creating a new class, and establishing rights which bore no relation to the previous rights of the Zamindars.' [R. Palme Dutt, *India To-day*, Part 1-6 (Bombay: People's Publishing House, 1946), p. 192]

[8] Government of Bengal, *Report of the Land Revenue Commmission Bengal*, Vol. 1 (Alipore: Begal Government Press, 1940), p. 42

[৫] Dr. Lutful Kabir, *The Rights and Liabilities of the Raiyats Under the Bengal Tenancy Act, 1885, and the State Acquisition and Tenancy Act, 1950: With Amendments* (Dacca: Law House Publication, 1972), pp. 430-431

[৬] Government of East Pakistan, *East Bengal State Acquisition and Tenancy Act, 1950*, Part I, Chapter I, Para. 1 (*1*) (Dacca: East Pakistan Government Press, 1965), p. 1

[৭] Ibid, See: Footnote 1, p. 1

[৮] বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*-২ (ঢাকা : সুবর্ণ, ২য় মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭), পৃ. ১৬১

[৯] আনিস চৌধুরী, *মানচিত্র* (ঢাকা : বাঙলা একাডেমী : বর্ধমান হাউস, ১ম প্র., অগ্রহায়ণ ১৩৭০), পৃ. ১৩

[১০] তদেব, পৃ. ১৪-১৫

[১১] তদেব, পৃ. ১৭

[১২] কামাখ্যা রায় চৌধুরী (লিখিত নোট), নগেন সরকার, খুলনা (লিখিত নোট)। [উদ্ধৃত, বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*-২, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫১]

[১৩] আনিস চৌধুরী, *মানচিত্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬

[১৪] উদ্ধৃত, বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*-৩, পৃ. ৬৯

[১৫] উদ্ধৃত, তদেব, পৃ. ৭০

[১৬] উদ্ধৃত, তদেব, পৃ. ৭৩

[১৭] আনিস চৌধুরী, *মানচিত্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২

[১৮] তদেব, পৃ. ১৬-১৭

[১৯] তদেব, পৃ. ৩০

[২০] তদেব, পৃ. ২-৩

[২১] তদেব, পৃ. ৪৭-৪৮

[২২] তদেব, পৃ. ৩০-৩১

[২৩] তদেব, পৃ. ৩২-৩৩

[২৪] তদেব, পৃ. ৫০

[২৫] তদেব, পৃ. ৬৬

[২৬] তদেব

[২৭] তদেব, পৃ. ১৩

[২৮] কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস, 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার', *কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস রচনা সংকলন*, প্রথম খণ্ড (কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২য় প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০১২), পৃ. ২৮

[২৯] W. H. Bruford, *Chekhov and his Russia: A Sociological Study* (London: Routledge & Kegan Paul Ltd, 1948), p. 83

[৩০] Anton Tchekhof, 'The Cherry Orchard', *Two Plays by Anton Tchekhof: The Seagull and The Cherry Orchard*, Translated by George Calderon (London: The Travellers' Library, 1927), pp. 171-172

[৩১] Ibid, p. 253

[৩২] W. H. Bruford, *Chekhov and his Russia: A Sociological Study,* Ibid, p. 149

[৩৩] Anton Tchekhof, 'The Cherry Orchard', *Two Plays by Anton Tchekhof: The Seagull and The Cherry Orchard*, Translated by George Calderon, Ibid, p. 205

[৩৪] আনিস চৌধুরী, *মানচিত্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮

[৩৫] সুকুমার বিশ্বাস *মানচিত্র* নাটকটিকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জীবনের রূপায়ণ হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন , "মানচিত্রে' দারিদ্র্যপীড়িত মধবিত্তের [মধ্যবিত্তের] জীবন-কথা বিধৃত হয়েছে। নাট্যকারের চরিত্রাবলী মধ্যবিত্ত সমাজ-উদ্ভূত, অতি পরিচিত। মধ্যবিত্ত সমাজজাত চিত্র নাট্যকার দক্ষতার সঙ্গেই পরিস্ফুট করেছেন।' [সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম পু. মু., মার্চ ১৯৯৮), পৃ. ২৪২-২৪৩] সৈয়দা খালেদা জাহান নাটকটিকে নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের' রূপায়ণ হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন, 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও এদেশের জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়ন সম্ভব হয়নি। সমাজের মুষ্টিমেয় বিত্তবান লোক ছাড়া বাকি সবাই মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সমাজের এই বৃহৎ জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত হয়ে হতাশাগ্রস্ত জীবনযাপন করেছে। আনিস চৌধুরীর 'মানচিত্র' নাটককে [নাটকে] তুলে ধরেছেন অর্থনৈতিক সমস্যা সংবলিত তেমনি এক নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনালেখ্য।' [সৈয়দা খালেদা জাহান, *বাংলাদেশের নাটকে রাজনীতি ও সমাজ সচেতনতা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম প্র. মে ২০০৩), পৃ. ১২৬] মীর হুমায়ূন কবীর নাটকটিকে মধ্যবিত্তের জীবনালেখ্য হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, 'বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যপর্যায়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জীবন-পরিসরে দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত এক শিক্ষিত-পরিবারের দ্বন্দ্ব-সংকটের করুণ কাহিনি বিধৃত হয়েছে এ নাটকে (*মানচিত্র*)।' [মীর হুমায়ূন কবীর, *আনিস চৌধুরীর নাটক : জীবন ও শিল্প* (ঢাকা : বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, ১ম প্র. ডিসেম্বর ২০১৭), পৃ. ৬৫]